জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত
জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক ত্রৈমাসিক

নবীন বিজ্ঞানী

সেপ্টেম্বর, ২০১৯

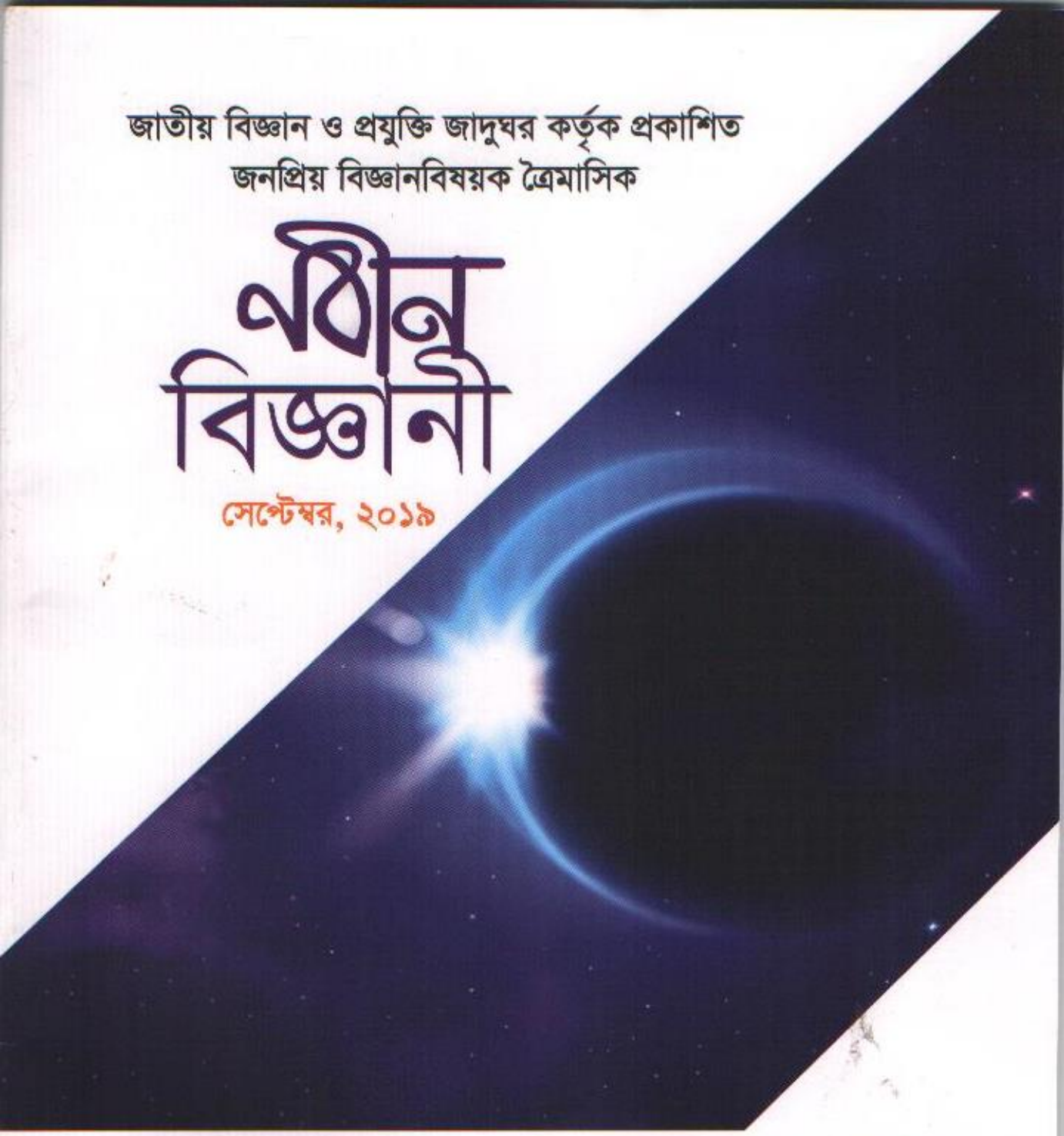

- অ্যাস্ট্রোনমি থেকে কসমোলজি-১
- বিজ্ঞান আন্দোলনে প্রাতঃস্মরণীয়
- জিন না পরিবেশ

বিজ্ঞান আন্দোলনে প্রাতঃস্মরণীয়

ড. আমানুল ইসলাম

বিজ্ঞানের চর্চা তো কত মানুষই করেন। দেশের-দশের কথা ভেবে সাধারণজনের জন্য বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার, চিন্তাভাবনা করার মানুষ কিন্তু খুব বেশি নেই। বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানসেবী বুদ্ধিজীবী শ্রেণির যে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা আইনস্টাইন, বার্ট্রান্ড রাসেল, জেডি বার্নাল, হ্যালডেনের মতো সমাজসচেতন মনীষীরা উচ্চ কণ্ঠে বলে গেছেন, সে পবিত্র দায়িত্ব পালনের পথে কতজন হাঁটেন? এই প্রবন্ধে যে তিনজন বিজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কথা বলতে যাচ্ছি তাঁরা সেই হাতে গোনা মানুষদের দলভুক্ত, যারা এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছেন। এই তিনজনের মধ্যে দুজন বাংলাদেশি ও আরেকজন বাংলাদেশি না হলেও বাঙালি। তাঁরা নির্লিপ্তভাবে কিংবা যান্ত্রিকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা করেননি। বিজ্ঞানের অঙ্গনে থেকে তাঁরা সামাজিক দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন। তিনজনই মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার কাজে শ্রম দিয়েছেন। স্বীয় অবস্থান থেকে দেশের বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে গেছেন। তাঁরা বলতেন বিজ্ঞানকে নিয়ে যেতে হবে মানুষের কাছে। এমন এক বিজ্ঞান যা দেশের মানুষের কাছে বোধ্য, আর তাদের জীবন-সংগ্রামের সহযাত্রী। এমনি বিজ্ঞানের বিকাশের মাধ্যমে ঘটবে দেশের মানুষের সার্বিক সমৃদ্ধি।

আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন (১৯৩০-১৯৯৮)

'একটা বিজ্ঞান আন্দোলন চাই। স্বাধীনতার আন্দোলন হয়, গণতন্ত্রের আন্দোলন হয়, বিজ্ঞানের কি আন্দোলন হয় না? বিজ্ঞানেরও আন্দোলন হয়। বিজ্ঞানের আন্দোলন চাই আমাদের চারপাশের প্রকৃতিকে আর পরিবেশকে জানা আর বোঝার জন্যে, তাকে কাজে লাগাবার জন্যে। আনন্দের জন্যেও।' কথাগুলো প্রয়াত বিজ্ঞান লেখক ও শিক্ষাবিদ ড. আবদুল্লাহ আল-মুতীর। যে বিজ্ঞান আন্দোলনের কথা এখানে বলা হয়েছে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তা দানা বাঁধতে থাকে। আশির দশকের দিকে এসে তা বিশেষ মাত্রা পায়। দেশের কিশোর-তরুণ ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় দেশের নানা প্রান্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শত শত বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে ওঠে। তখন বিজ্ঞান ক্লাবকে কেন্দ্র করে নবীন বিজ্ঞানীরা মেতে উঠেছিল বিজ্ঞানভিত্তিক নানা তৎপরতায়। এমনি বিজ্ঞান আন্দোলন সৃজনে যে কয়েকজন মানুষ পথিকৃতের ভূমিকা রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবদুলাহ আল-মুতী হলেন অগ্রগণ্য। দেশের বিজ্ঞান আন্দোলনের আজকের ক্ষীণধারাকে বলিষ্ঠ করার বিষয়টি যতবার সামনে আসবে ততবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে আবদুল্লাহ আল-মুতীর নাম। নিসর্গবিদ ও বিজ্ঞান লেখক দ্বিজেন শর্মা আবদুল্লাহ আল-মুতী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'সমাজ বিপ্লবের জন্য যুক্তিবাদের প্রচার অত্যাবশ্যক এবং আল মুতী সেই জরুরি কর্তব্যটি পালন করেছেন। তিনি নতুন প্রজন্মের হাতে বিজ্ঞানচিন্তার হাতিয়ার তুলে দিয়ে একজন বিপ্লবীর সমান কর্তব্য পালন করেছেন।' কবি শামসুর রাহমান তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, চারিদিকে বহু লোক আত্মপ্রচারে এমন মোহগ্রস্ত যে আবদুল্লাহ আল-মুতীর নাম বৈপরীত্যে, বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।' আসলে কেমন ছিল বরেণ্য এই মানুষটির জীবন- একটু জেনে নেওয়া যাক।

সিরাজগঞ্জ জেলার ফুলবাড়ী গ্রামে ১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে বিএসসি ও এমএসসি সম্পন্ন করেন। ১৯৫৩ সালে এমএসসি পাস করার পর তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় রাজশাহী সরকারি কলেজে পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা বিষয়ে ১৯৬০ সালে এমএ ও ১৯৬২ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, মস্কোতে বাংলাদেশ দূতাবাসে শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক কাউন্সিলর, বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও বিজ্ঞানবিষয়ক মন্ত্রলালয়ে যুগ্ম সচিব থেকে শুরু করে সচিব হিসেবে অবসর নেন।

কর্মতৎপরতা : ইন্টারমিডিয়েটে পড়ার সময় তিনি মুকুল ফৌজের সাথে যুক্ত হন। পরে শিশু সংগঠন কচি কাঁচার মেলা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পাকিস্তান আমলে প্রগতি লেখক সংঘের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ছিলেন। একুশের গুলিবর্ষণের কয়েক দিনের মধ্যে প্রথম যে ইশতেহার বের হয় তার অধিকাংশ লেখাই ছিল আবদুল্লাহ আল-মুতীর। কর্মজীবনের নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সক্রিয়ভাবে নানা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সামগ্রিকভাবে তিনি দেশের বিজ্ঞান আন্দোলনের এক পুরোধা ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন । ১৯৭৮ সাল থেকে দেশে যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ পালিত হয়ে আসছে, তার উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন। দেশজুড়ে বিজ্ঞান ক্লাব বিস্তারে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকার সময় বিজ্ঞান ক্লাব নির্দেশিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন এসব বিজ্ঞান ক্লাবের মাধ্যমে শুধু তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ ঘটে তা নয়, বিজ্ঞানী, তরুণ সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে বাঞ্ছিত যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তিনি তাঁর লেখায় আশাবাদ প্রকাশ করেছেন– 'দেশের বিজ্ঞান ক্লাবগুলো আরো প্রসার লাভ করবে। এ দেশের মানুষের জীবনের সমস্যার সাথে ক্লাবগুলোর সম্পর্ক নিবিড় থেকে নিবিড়তর হবে' (আজকের বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ)। দেশে যেসব বিজ্ঞান ক্লাব বা সংগঠন এখন সক্রিয় তারা তাঁর ভাবনা থেকে কর্মপ্রেরণা পেতে পারে। বাংলাদেশ বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ আল-মুতী বিজ্ঞান শিক্ষা সমিতি, বিজ্ঞান-মঞ্চ, বাংলাদেশ একডেমি অব সায়েন্স, খেলাঘরসহ বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবে জড়িত ছিলেন। সক্রিয়ভাবে বাংলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠান দুটিতে সভাপতির দায়িত্ব পালনও করেছেন। তিনি শিক্ষা উন্নয়নবিষয়ক বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেছেন।

লেখালিখি: বিজ্ঞানের কথা সহজ করে বলা খুব সহজ কাজ নয়। আর এই কাজটিই তিনি সারা জীবন দক্ষতার সাথে করে গেছেন। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয় আবদুল্লাহ আল-মুতীর বিজ্ঞানবিষয়ক প্রথম মৌলিক গ্রন্থ 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে'। সাধারণ পাঠক এবং শিশু-কিশোরদের জন্য সহজ ভাষায় ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে লিখেছেন। জনবোধ্য বিজ্ঞান যেমন তার লেখার ক্ষেত্র ছিল তেমনি পরিবেশ, বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান সংস্কৃতি, বিজ্ঞান আন্দোলন, বিজ্ঞানমনস্কতার গুরুত্ব বাস্তবভাবে তুলে ধরা, বিজ্ঞান শিক্ষার পথে যেসব আর্থসামাজিক অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে জাতীয় উন্নয়নের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন। তাঁরই পরামর্শে ও সম্পাদনায় দৈনিক সংবাদ পত্রিকার মাধ্যমে প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক আলাদা পাতা প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়। যেটা উল্লেখ না করলেই নয় ছোটদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাঁর মতো পরম যত্নে বাংলাদেশে খুব কম লেখকই লিখেছেন। তাঁর রচিত

বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা ৩১। লিখিত মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে- অবাক পৃথিবী, আবিষ্কারের নেশায়, রহস্যের শেষ নেই, বিজ্ঞান ও মানুষ, এ যুগের বিজ্ঞান, তারার দেশের হাতছানি, প্রাণলোক: নতুন দিগন্ত, কীটপতঙ্গের বিচিত্র জগৎ, আজকের বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ, মহাকাশে কী ঘটছে, আমাদের শিক্ষা কোন পথে বইগুলোর কথা। সম্পাদিত বইগুলোর মধ্যে নাম করা যেতে পারে বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড), শিশু একাডেমির শিশু বিশ্বকোষ, বাংলাদেশের বিজ্ঞানচিন্তা'র কথা। রয়েছে অনুবাদ গ্রন্থও। এছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন। শিক্ষা ও বিজ্ঞান নিয়ে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিভিন্ন সময় তাঁর কথিকা ও আলোচনা প্রচারিত হয়েছে। তিনি মনে করতেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারাকে সমাজের সকল স্তরে প্রবাহিত করতে হলে সেটা মাতৃভাষা বাংলাতেই করতে হবে। তাই নিজে যেমন লিখতেন অন্যদেরকেও লেখালিখিতে উৎসাহ দিতেন। বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গ্রন্থকারদের প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বাংলা একাডেমি আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীনের প্রদত্ত অর্থে দ্বিবার্ষিকভাবে হালীমা শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার প্রদান করে থাকে। শইখ শরফুদ্দীন ও হালীমা বেগম হচ্ছেন আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীনের পিতা-মাতা।

দীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে ইউনেস্কোর কলিঙ্গ পুরস্কার, শিক্ষাক্ষেত্রে একুশে পদক, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার। ১৯৯৮ সালের ৩০ নভেম্বর আটষট্টি বছর বয়সে কর্মনিষ্ঠ এই মানুষটির মৃত্যু ঘটে। তিনি মনে প্রাণে ধারণ করতেন- বিজ্ঞান চেতনায় সমৃদ্ধ মননের ওপর ভর করে বিজ্ঞান সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। বিজ্ঞানের চর্চা জন্ম দেয় নতুন আকাঙ্ক্ষার, বদলে দেয় মানুষকে, মানুষের সমাজকে। এই ভাবনার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় তাঁর লেখনীতে, তার সাংগঠনিক সক্রিয়তায়, তাঁর প্রশাসনিক উদ্যোগে। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে তার বইগুলো অমূল্য সম্পদ। যা মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ভিতকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তিনি পরবর্তী প্রজন্মকে পথের দিশা দিয়ে গেছেন- লেখার ক্ষেত্রে তো বটেই, চিন্তার ক্ষেত্রেও। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায়, বিজ্ঞানের জনমুখীকরণে আবদুল্লাহ আল-মুতীর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ড. এ আর খান (১৯৩২-২০১৫)

ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে একটা বিজ্ঞান আলোচনা চলছে। সেখানে উপস্থিত তরুণ শ্রোতাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন একজন চুলপাকা চশমা চোখে শ্বেতশুভ্র চেহারার মানুষ। তিনি বলছেন, 'ধর, তোমরা একটা মহাকাশযানে করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তারপর দেখলে যে একটা সুন্দর গ্রহ দেখা যায়। নীল, তার মধ্যে আবার সাদা সাদা মেঘ। কাছে গিয়ে দেখলে যে এখানে জীবন আছে, গাছ আছে, জীব আছে। কিন্তু আরেকটু কাছে গিয়ে দেখলে যে এখানে বুদ্ধিমান জীব আছে! কিন্তু আরেকটু কাছে গিয়ে দেখলে যে, এই বুদ্ধিমান জীবেরা একে অপরকে হত্যা করার জন্য সবচেয়ে বেশি খরচ করে। তখন কি তোমরা সেই গ্রহতে নামবে? নিশ্চয়ই নামবে না। আমরা সেই অবস্থায় আছি। এ জন্যই আমি মনে করি যে, আমরা যদি মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটা অনুভূতি নিজের মনে রাখতে পারি, তাহলে আমরা মনুষ্যত্ব বলতে যেটা বোঝায় তার অন্তত কিছুটা আমরা পাব।' কথাগুলো দেশের অন্যতম জ্যোতির্বিদ ড. আনোয়ারুর রহমান খানের। যিনি ড. এ আর খান নামে বেশি পরিচিত।

ড. এ আর খানের জন্ম ১৯৩২ সালে ঢাকার বিক্রমপুরের (বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ জেলা) শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর গ্রামে। ১৯৪৬ সালে তিনি কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় ভর্তি হন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাস করার পর এ আর খান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬০ সালে তিনি কলম্বো প্যান ফেলো হিসেবে যুক্তরাজ্যে যান। সেখানে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরিতে গবেষকরূপে কাজ করেন। পিএইচডি করার সময় ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডনের ইমপেরিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে শিক্ষকতা ও গবেষণা করেন। এখান থেকে তিনি ১৯৬৭ সালে পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে প্রত্যাবর্তন করেন।

কর্মতৎপরতা : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের উষালগ্নে ড. এ আর খান ঢাকা থেকে গ্রামে এসে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন। এ সময় তিনি নিজ গ্রাম ষোলঘর বাজারে এক নারী নির্যাতনকারীকে হাত বেঁধে রোদে দাঁড় করিয়ে প্রকাশ্যে শাস্তি দেন। যা শ্রীনগরে ছড়িয়ে পড়লে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে এলাকায় দ্বিতীয় কোনো নারী নির্যাতনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। স্বাধীনতার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করে জয়লাভ করেন। দুই দফায় তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। উচ্চশিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে তিনি তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ছড়িয়ে দিতে বিজ্ঞান আন্দোলনে যুক্ত হোন। ১৯৭৫ সালে অনুসন্ধিৎসু চক্র বিজ্ঞান সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। এ সংগঠনের প্রথম সভাপতি ছিলেন নটর ডেম কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক তমাল কান্তি দত্ত। তাঁর পরে অনুসন্ধিৎসু চক্রের সভাপতির দায়িত্ব অর্পিত হয় ড. এ আর খানের ওপর। দীর্ঘদিন তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশে হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণে গঠিত জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক। অনুসন্ধিৎসু চক্রের উদ্যোগে ২০০৩ সালে দেশজুড়ে মঙ্গল উৎসব, ২০০৪ সালের শুক্রগ্রহের ট্রানজিট, ২০০৯ সালে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ আয়োজনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশে ২০০৬ সালের ৩১ জানুয়ারি ঠাকুরগাঁও জেলায় উল্কাপিণ্ড পতনের ঘটনা ঘটে। ১৯৪২ সালের পর এটিই বাংলাদেশের একমাত্র উল্কাপিণ্ড পতন। সে সময় ড. এ আর খানকে প্রধান করে সিংপাড়া উল্কাপিণ্ড জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। তখন তাঁর নেতৃত্বে বিজ্ঞান সংগঠন অনুসন্ধিৎসু চক্র বাংলাদেশ সরকারকে দুর্লভ এই উল্কাপিণ্ড সংগ্রহে সহযোগিতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রধান ভূমিকা রাখে। ইউনেস্কো ২০০৯ সালকে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বছর হিসেবে ঘোষণা করে। প্যারিসে এ উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ড. এ আর খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিকস বিভাগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা ২০ এর অধিক। তিনি দীর্ঘদিন দেশে বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে কাজ করে গেছেন। ২০০৩ সালে দেশে বিজ্ঞানচর্চায় গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য অনুসন্ধিৎসু চক্র ড. এ আর খানকে বিশেষ 'অনুসন্ধিৎসু' সম্মাননা প্রদান করে। জ্যোতির্বিদ ড. এ আর খান তরুণদের সাথে কাজ করতেন। নিজেও ছিলেন তরুণপ্রাণ। সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। সাইকেল ছিল তাঁর বাহন। যেকোন অনুষ্ঠান, আহ্বানে নিজে সাইকেল চালিয়ে উপস্থিত হতেন। তরুণদের বলতেন, সাইকেল চালালে স্বাস্থ্য ভালো থাকে, পরিবেশও

দূষণমুক্ত থাকে। তিনি ছবি তুলতে পছন্দ করতেন। দাবা ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ছিলেন দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক আরবিটার বা দাবা বিচারক। তিনি বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদ, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি, বাংলাদেশ ঘুড়ি ফেডারেশনের সাথেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের আঙিনায় একটি বিশালাকার সৌরঘড়ি নির্মিত হয়েছে, যার নাম 'ড. এ আর খান সৌরঘড়ি'। অনুসন্ধিৎসু চক্রের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি মো. শাহজাহান মৃধার তত্ত্বাবধানে এটি নির্মিত হয়েছে।

২০১৫ সালের ২৫ মে লন্ডনের একটি হাসপাতালে আকাশপ্রেমী এই মানুষটি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণ ও বিজ্ঞান প্রসারে তাঁর অবদান নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে, উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো পথ দেখাবে।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫০-২০০৮)

বর্তমান সময়ের অনেকের কাছে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি তেমন একটা পরিচিত নয়। কিন্তু নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গের উৎস মানুষ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের কিছু বিজ্ঞানকর্মীকে আলোকিত করেছিল তাদের কিছু প্রকাশনার মাধ্যমে। আর পাশের পশ্চিমবঙ্গে ৮০-৯০ এর দশকে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উৎস মানুষ পত্রিকাটি হয়ে উঠেছিল বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারক-বাহক। পাঠকের সদয় অবগতির জন্য উৎস মানুষ সোসাইটির কিছু বইপত্রের নাম এখানে উল্লেখ করছি, যেগুলো এখনো এদেশে পাওয়া যায়। যেমন: বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান, প্রমিথিউসের পথে, বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ, খাবার নিয়ে ভাবার আছে, সাপ নিয়ে কিংবদন্তী, শেকল ভাঙ্গা সংস্কৃতি, আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান, প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে, যে গল্পের শেষ নেই, তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক, এটা কী ওটা কেন, মূল্যবোধ, উৎস মানুষ পত্রিকা। তবে শুধু বইয়ের নাম দিয়ে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনা যাবে না।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৫০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায়। তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জাতীয় বৃত্তি নিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পদার্থবিজ্ঞানে মওলানা আজাদ কলেজ থেকে সাম্মানিক ডিগ্রি লাভ করেন। স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি অর্জন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কর্মজীবনে প্রথমে বিড়লা মিউজিয়াম ও পরে আকাশবাণীতে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কিছুদিন কাজ করেন। পরে আমৃত্যু বেলগাছিয়ার স্টেট অব ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে ব্যালাস্টিক এক্সপার্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কর্মতৎপরতা : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই সমমনা আরো কয়েকজন নিয়ে ১৯৮০ সালে 'উৎস মানুষ'-এর যাত্রা শুরু হয়। তাঁর সম্পাদনায় ১৯৮০ সাল থেকে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলায় সহজভাবে যৌক্তিক চিন্তা ও বিজ্ঞান আলোচনার এক নিজস্ব বলয় তৈরি করেছিল 'উৎস মানুষ' পত্রিকা। যার মূলকথা–এলিট বিজ্ঞান নয়, চারধারে প্রতিদিনের জীবনে, কর্মে ও সংস্কৃতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের চর্চা শুধু পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরে, ল্যাবরেটরির গবেষণা, বিশেষজ্ঞের জটিল জ্ঞান বা যন্ত্রপাতির প্রয়োগের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ থাকলে তার মধ্যে সাধারণ মানুষ প্রবেশ করতে পারে না। তাই অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণকেন্দ্রিক বিজ্ঞান আন্দোলনের জন্য কাজ করেছেন। তিনি বলতেন, মানুষের জন্য

বিজ্ঞান, মানুষকে নিয়ে বিজ্ঞান, মানুষকে দিয়ে বিজ্ঞান। যে বিজ্ঞান জানলে জানালে সাধারণ মানুষের পক্ষে দৈনন্দিন জীবনে সুস্থভাবে বাঁচা সম্ভব, ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক যাচাই করা সম্ভব, সাধারণ মানুষের বিপক্ষে থাকে এমন মানুষকে ও কাজকে চিনে নেওয়া সম্ভব, তেমন বিজ্ঞান নিয়ে তিনি সহজ করে লিখতেন। সাথে অন্যদের লিখতে উদ্বুদ্ধ করতেন। যত্নের সাথে অন্যের লেখাকে সুখপাঠ্য করে তুলতেন। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, সরকারি উচ্চ পদে চাকরির সুবিধা এবং পত্রিকাসূত্রের পরিচিতির জোরে ইচ্ছে করলেই তারকা লেখক হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে পথে হাঁটেননি। লেখালিখি-বই প্রকাশ ছাড়াও মফস্বল অঞ্চলে, কলকাতায় অনেক পাঠচক্রে, কুসংস্কারবিরোধী সংগঠন, বিজ্ঞান ক্লাব ইত্যাদি গঠনে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচুর সাংগঠনিক শ্রম দিয়েছেন। সামগ্রিকভাবে তাঁর কর্মের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন আত্মপ্রচারবিমুখ এই মানুষটি। বহু সংগঠন ও সামাজিক নানা কাজকর্মে যুক্ত মানুষজন 'উৎস মানুষ' থেকে নিয়েছেন কাজের প্রেরণা। উৎস মানুষের ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে অনেকে গড়ে তোলেন বিজ্ঞান সংগঠন। এসব সংগঠনের কাজের পরিসর ছিল বহুমুখী– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ওষুধ, পানি, জলাভূমি, মানবাধিকার, পরিবেশ, পরিবেশসম্মত কৃষি ও কুসংস্কার। পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত উৎস মানুষ থেকে প্রেরণা পেয়েছিল বাংলাদেশর কিছু উৎসাহী মানুষ। যার রেশ রয়ে গেছে আজও। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বজলুর রহিম সম্পাদিত মাসিক গণস্বাস্থ্য পত্রিকায় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

ডক্টর অশোক বিজ্ঞানমনস্ক মানবিক মূল্যবোধ গড়ার কাজে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন সদা সক্রিয়। ২০০৮ সালের ১৭ নভেম্বর বঙ্গীয় গণবিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় এই মানুষটি মৃত্যুবরণ করেন। আজ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলেও তাঁর লেখা আছে। সামষ্টিক শ্রমে উৎস মানুষ নামের উদ্যোগটিও বেঁচে আছে। মাঝখানে কিছুদিন বন্ধ থাকার পর উৎস মানুষ পত্রিকাটি কলকাতা থেকে এখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। আশা- এদেশেও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'উৎস মানুষ' নিয়ে আলোচনা হবে। 'উৎস মানুষ' থেকে প্রকাশিত কিছু বই ঢাকার শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটের বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়। এছাড়া পত্রিকাটির অনলাইন সংস্করণগুলো পড়া যাবে এই ওয়েবসাইটে-www.utsamanush.com।

ওপরে বাংলা ভাষার যে তিনজন অগ্রণী বিজ্ঞানসেবীর কথা বলা হলো তাঁদের আমরা হারিয়েছি। কিন্তু তাঁদের কর্ম আছে, লেখা আছে, ভাবনাগুলো টিকে আছে। বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানকে অনুধাবন করে কাজগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আরো সামনে। আমরা বিজ্ঞানোৎসাহীরা যদি যার যার অবস্থান থেকে নিজ সাধ্যানুযায়ী সেই কাজকে এগিয়ে নিতে সক্রিয় হই, তাহলেই তাঁদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানানো হবে। শুধু সম্মান জানানোই নয় তাঁদের বৈজ্ঞানিক মননের সাথে আত্মীয়তাও স্থাপন করতে হবে। আশা রাখছি এই মানুষদের জীবন ও লেখালিখি থেকে বিজ্ঞান আন্দোলনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের কর্মধারাকে আরো বলিষ্ঠ আরো উন্নততর করার উৎসাহ, উদ্দীপনা অর্জন করবেন।

প্রবন্ধকার : অনুসন্ধিৎসু চক্র বিজ্ঞান সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ঠিকানা: অনুসন্ধিৎসু চক্র, কেন্দ্রীয় কার্যালয়: ৪৮/১, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪।